শিশু–কিশোর মনস্তত্ত্বের আঙ্গিকে কয়েকটি বাংলা ছোটোগল্প

বৈশালী বসু (রায় চৌধুরী)

Abstract

(The psychology of children and adolescents in selected Bengali short stories)

In the flow of time, small but unbroken pieces of life have been properly reflected in Bengali short stories. As life becomes more complex, the problems associated with life become more numerous. Bengali short stories have masterfully identified the various dimensions of changing life. The gradual disappearance of authenticity is a feature of modern life. Behind the masked face there lies various secrets; thus making it difficult to disentangle the original identity from the mask. This secret of self-identity is most unstable, most confusing to the mind of children. In an age when the world unveils its inner appearance, juice, colour, flavours, the children seek to infuse in infinite interest. But suddenly they feel they have to confront the world through an unidentified black curtain, courtesy to the complexity of modern civilization. They want to find the faces of their loved ones by removing the veil of this black screen but sometimes they fail. While growing up from childhood to adolescence, the ways of society, self-realization, and ethics make confront various issues. Like psychologists, authors also seek and find answers to these questions and issues.

When the older generations look at today's generation from their perspectives, the new-age children-adolescents appearing to be self-centered, irresponsible, valueless, or of unknown values may surprise them. There are strange contradictions among the adolescents: sometimes the bigotry of neglect and satiric criticism by the older generations are reflected in them; at other times they act as too young denying their responsibility. As a result, the figures of these confused children have repeatedly come up in the composition of short stories. The representative writers like Radharani Devi, Ashalata Singha, Kabita Singha, Pratibha Basu, Mahashweta Devi and others try to portray the pictures of children and teenagers in various ways. Following these stories, it becomes obvious that literary texts can be meaningful in analyzing the mind of children and teens easily combining cognition with merit.

Key words: Bengali short stories, children - teens, psychology, writers, analysis.

ঊনবিংশ শতকের এক বিশেষ কাল – 'Peculiar product of nineteenth century'[১] হিসেবে যাকে অভিহিত করা হয়েছে, একবিংশ শতকের প্রথম দশকে তার দিকে দৃষ্টি অভিমুখ ঘোরালে দেখা যায় সেই ছোটগল্প ইতিমধ্যেই একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সফল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যমাধ্যম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন :

(১) ছোটগল্পে ঘটনাগত, মনস্তত্ত্বগত বা চরিত্রগত – একটিমাত্র সমস্যারই সংকটরূপ দেখানো হবে।

(২) বহমান জীবনের মধ্য থেকে লেখকের অনুভূতি একটি বিশিষ্ট প্রতীতিকে আহরণ করে নেবে – সেটা তার নিজস্ব দর্শন বা আদর্শের অনুকূল হতে পারে, প্রতিকুলও হতে পারে, হয় তার মধ্যে লেখক একটি কাঙ্ক্ষিত সত্যকে আবিষ্কার করবেন অথবা তার অন্তর্নিহিত একটি মিথ্যাকে নির্দেশ করে দেবেন।

(৩) ছোটগল্প পড়তে গিয়ে আমরা লেখকের ব্যক্তিত্বেরই একটা পরিস্রুত রূপ দেখতে পাব, লাভ করব লেখকের চরিত্র ও মানসিকতা অনুযায়ী এক অপূর্ব সংবেদনা, সেটি লেখকেরই সত্তার প্রতীক, গল্পের স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত, সম্প্রসারিত করবেন – 'project himself'।[২]

এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুসরণ করে দেখতে পাই সময়ের বহমান ধারায় বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে জীবনের টুকরো টুকরো অথচ নিটোল ছবি। জীবন যত জটিল হয়েছে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্যা হয়েছে তত বহুমাত্রিক। ছোটগল্প অত্যন্ত নিপুণভাবে সে বিভিন্ন মাত্রাগুলিকে চিহ্নিত করেছে।

আধুনিক জীবন থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে অকৃত্রিমতার অনাবৃত অবয়ব। মুখ ঢেকে যাচ্ছে গোপনতার নানা রঙের মুখোশে, সেই মুখোশের আড়াল থেকে সঠিক মুখটি চিহ্নিত করা বড় কঠিন। স্ব–পরিচয়ের এই গোপনতা সব থেকে অস্থির, সব থেকে বিভ্রান্ত করে শিশু–কিশোর মনকে। এ এমন এক বয়স যখন পৃথিবী পরতে পরতে তার সামনে মেলে দেয় তার অভ্যন্তরের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, নিষ্পাপ শৈশব, অনুসন্ধিৎসু কৈশোর অসীম আগ্রহে ছুঁতে চায় সেই অনাস্বাদিত আনন্দকে। কিন্তু হঠাৎই তারা অনুভব করে তাদের চাওয়া আর পৃথিবীর দেওয়ার মধ্যে আছে এক অচেনা কালো পরদা যা আধুনিক সভ্যতার দান। এই কালো পর্দার আড়াল সরিয়ে তারা খুঁজতে চায় আত্মজনের প্রিয় মুখগুলিকে। শৈশব–কৈশোরের মনস্তত্ত্ব যতটা সহজ, ততটাই জটিল। মনস্তাত্ত্বিকদের তত্ত্বে, ব্যাখ্যায় নানাভাবে উঠে এসেছে এই বয়সের বিভিন্ন চারিত্রিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদের মতের অনুসরণ

করা যায় –

জাঁ পিয়াজে শিশুর প্রজ্ঞামূলক বিকাশের চারটি স্তরের কথা বলেছেন –

- সংবেদন চালকমূলক স্তর –যার বৈশিষ্ট্য হল আত্মকেন্দ্রিকতা, এই সময় শিশুর বস্তুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন বোধ থাকে না।
- প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর – এই স্তরে শিশু ধীরে ধীরে বাস্তব জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সব বস্তুকেই সজীব মনে করে, মনে করে সব কিছুই মানুষের সৃষ্টি, অযৌক্তিকভাবে কার্যকারণ বিচার করে।
- সক্রিয়তামূলক স্তর – এই স্তরে মানসিক ধারণা স্পষ্ট হয়, বস্তুর শ্রেণিকরণ করতে পারে, সংখ্যার ধারণা হয়।
- মৌখিক সক্রিয়তার স্তর – এই সময়ে শিশু ও কিশোররা সম্ভাবনা থেকে বাস্তবকে পৃথক করতে পারে। সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠন করতে পারে।[৩]

এল. কোহলবার্গের শিশু–কিশোরের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি নৈতিক বিকাশের তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন –

- প্রাক্ প্রথাগত পর্যায় – এই পর্যায়ে শিশু শাস্তি এড়ানোর জন্য অন্যের বাধ্য হয় এবং নিয়মনীতি অনুসরণ করে, শুধু স্বার্থরক্ষার কথাই ভাবে।
- প্রথাগত পর্যায়ে – এই পর্যায়ে বালকরা অপরের সমর্থন আকাঙ্ক্ষা করে নিয়মনীতি প্রাধান্য পায়।
- উত্তর–প্রথাগত পর্যায় – নীতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে যুক্তি–সংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সক্রিয় বিবেক এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য।[৪]

মাস্‌লোর তত্ত্ব – মাস্‌লো শিশু–কিশোরদের নানারকম চাহিদাকে ক্রমপর্যায় অনুযায়ী একটি পিরামিডের আকারে প্রকাশ করেছেন।[৫]

আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা
আত্মসম্মানের চাহিদা
ভালোবাসা নিরাপত্তার চাহিদা
নিরাপত্তার চাহিদা
শারীরবৃত্তীয় চাহিদা

এস আর লেকক বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্যাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন –

- বিদ্যালয়, সমাজও বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান
- পরিবারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি
- উপযুক্ত বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান
- সুষ্ঠু জীবনদর্শন[৬]

শালট পোপ বয়ঃসন্ধির নিম্নলিখিত চাহিদাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন –

- যৌন চাহিদা
- নিরাপত্তার চাহিদা
- আত্মসক্রিয়তার চাহিদা
- নৈতিক চাহিদা
- সমাজজীবনের চাহিদা[৭]

বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদদের তত্ত্বগুলি আলোচনা করলে মূলত যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা হল – শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে কৈশোরে পৌঁছতে পৌঁছতে সমাজ, আত্মজিজ্ঞাসা, নীতিবোধ তাকে নানারকম প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। এই প্রশ্নগুলির উত্তর সাহিত্যিকরাও তাঁদের মত করে খুঁজেছেন।

বয়স্ক চোখ যখন তাদের দৃষ্টি দিয়ে আজকের প্রজন্মকে দেখে তখন আত্মকেন্দ্রিক, দায়বদ্ধতাশূন্য, মূল্যবোধহীন অথবা আগের প্রজন্মের অজানা মূল্যবোধসম্পন্ন শৈশব–কৈশোর তাদের বিস্মিত করে দেয়। অদ্ভুত স্ববিরোধিতা এদের মধ্যে, কখনো কখনো বয়স্কদের অবজ্ঞা এবংব্যঙ্গ করার মত বড় আবার কখনো ছেলেমানুষির ঘেরাটোপে নিজেদের আটকে রেখে বাস্তবের দায়িত্ববোধকে অস্বীকার করা মত ছোট। ফলত ছোটগল্পকারদের রচনায় বারবার উঠে এসেছে এই বিভ্রান্ত শিশু–কিশোর মুখগুলি, গল্পের আয়নায় বিম্বিত হয়েছে তাদের মনের ভাব। প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন লেখিকার ছোটগল্পে শিশু–কিশোর মনের ছবি ধরা পড়েছে নানাভাবে।

উনিশ শতকের শেষদিকে নারীরা যখন অপরিচয়ের আড়াল দু'হাতে সরিয়ে দিলেন তখন সাময়িকপত্রগুলিও তাঁদের জন্য দরজা খুলে ধরল, অগ্রণী ভূমিকা নিল ভারতী অথবা আরো স্পষ্টভাবে বললে স্বর্ণকুমারী দেবী। সবে যখন নারীশিক্ষার সূর্য দীপ্যমান হয়ে উঠছে, তখনই এই লেখিকারা সেই প্রথম সূর্যের রাঙা রশ্মিকে তাদের

কলমে ধরলেন। সবদিক থেকে প্রায় সর্বতোভাবে সমাজ যাঁদের পেছনে ফেলে রাখার চেষ্টা করেছিল, তাঁদেরই রচনায় এমন সব বিষয় উঠে এসেছে যা কখনো সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার দর্পণ, কখনো এই একবিংশ শতকেও প্রাসঙ্গিক।

সেই সময়ের কয়েকটি গল্প এই প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি রাখে –

- **গল্পের নাম 'বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ',** লেখিকা রাধারাণী দেবী। এক বিদ্রোহিনী কিশোরীর গল্প। ছোটবেলা থেকে চারবোনের একজন বিন্দু দেখে এসেছে তার ভালোবাসার চাহিদা, আত্মসম্মানের চাহিদা, আত্মপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় এই চাহিদাগুলি প্রাথমিকভাবে যার দ্বারা সব থেকে বেশি বাধা পেয়েছে তিনি বিন্দুর মা, যিনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন বিন্দুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সামনে। যে পর্যায়ে বালিকা বিন্দু নিজে নিয়মনীতি মেনে অপরের সমর্থন কামনা করেছে, সেই পর্যায়ে তার মা স্বয়ংতাকে সমর্থন করতে পারেন নি। অদ্ভুতভাবে তার গোটা জীবন তাকে এই অসমর্থনের মুখে দাঁড় করিয়েছে, তাই পনেরো বছর বয়সের আগেই বিধবা হয়ে সে নিজের চারপাশে বিদ্রোহের প্রাচীর গড়ে তুলেছে। নিয়ম ভাঙা নয়, কঠোরভাবে নিয়ম মানার মধ্যেই তার বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে। এইভাবেই সে নিজের আত্মসম্মানের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করেছে।[৮]
- **আশালতা সিংহ**–র একটি ছোটগল্পের নামই **'মনস্তত্ত্ব'**। গল্পের কথক এক প্রবন্ধকার যিনি নারীপ্রগতির বিরোধী ঝাঁঝালো প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর মতের সবথেকে বড় সমর্থক তাঁর স্ত্রী। তাঁর বালিকা কন্যাটি কিন্তু স্কুলে যেতে চায়, সুন্দর করে বাঁচতে চায় – মার মতামত তাকে বিমর্ষ করে তোলে। লেখিকা মেয়েটির মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা এবং পারিবারিক চাহিদার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বন্দ্বের মুখোমুখি তার বাবাও। মেয়ের চাহিদা এবং দ্বন্দ্ব তাঁর মনোজগতেও বিবর্তন আনে, মেয়েটি যে সামাজিক নিয়মের সমর্থন খোঁজে, সেই সমর্থন সে অবশেষে পায় তার বাবার কাছে। বাবা চুপিচুপি তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। সংগোপনে জানান 'মেয়েটি পুরোপুরি উৎসাহে লেখাপড়া শিখিতেছে। এস্রাজ বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছে। আমি অবশ্য কাগজে পুরাদমে প্রবন্ধ লিখিতেছি এবং সে প্রবন্ধের সুর ঠিক তেমনি আছে, তেমনি ঝাঁঝালো এতটুকু বদলায় নাই। আমার এবম্বিধ আচরণ হয়তো মনস্তত্ত্বঘটিত কোন জটিলতম সমস্যার মধ্যে পড়ে। কিন্তু মনস্তত্ত্ব নামটাই শুনিয়াছি, ও বস্তু লইয়া

কখনো চর্চা করি নাই'। শিশুর আচরণ যে বড়দের মনস্তত্ত্বের ওপর কতটা প্রভাব ফেলতে পারে এ গল্প তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[৯]

- **অঞ্জলি দাশ**–এর 'শিকড়ের জীবন' গল্পে ছোট্ট বিট্টু ঠিক সেই দিনগুলোতেই ...কষ্ট পায়, যেদিন নিজের জন্য এক আইডেনটিটি খোঁজে। মা ওর একান্ত নিজস্ব। নিরাপত্তার যে বলয়ের অন্বেষণ একটি ছোট্ট মানুে করে, সেই অন্বেষণেই ধরা দেয় মা–এর 'স্নানের গন্ধ'। এই নির্ভরতা সংসার থেকে পালিয়ে যেতে চাওয়া মা–কে আবার স্বস্থানে স্থিত করে – 'ডালপালা মেলছে, পত্রবিন্যাস স্পষ্ট হচ্ছে। সবুজ–নির্ভরতা–আরো পত্রগুচ্ছ–নিবিড় হচ্ছে ছায়া। না, শিকড় তুলতে চায় না শ্রীনন্দা'।[১০]
- 'বান' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী এক অন্য বান–এর কথা শুনিয়েছেন। নদীতে আসা বান নয়–এ, এই বান 'গোরাপ্রেমের বান'– যে বান এলে বাগদি আর বামুন একই দাওয়ায় প্রসাদ পায় – চিনিবাসের মত ছোট্ট একটি ছেলে সেই বানের প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য চিনিবাসের, গৌরাঙ্গ তাদের গ্রামে আসার সময় পাননা। সামাজিক নিরাপত্তার আশার আলো ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠে সম্পূর্ণ নিভে যায়। চিনিবাস বলে 'গৌরাঙের বানের চে' সে বান ভালো রে আয়ি! তেমন বান আর আসে না? সেই যে, যেমন বানে চিড়ে–মুড়ি–চাল দেয় এত? দুস্কু ঘুচে যায়?' শুধু বেঁচে থাকার চাহিদার কাছে ফিকে হয়ে যায় সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা।[১১]

লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী বসু, নবনীতা দেবসেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য এমন পাঁচ প্রতিনিধিস্থানীয় লেখিকা যাঁদের লেখায় সমাজ–ছবি বিম্বিত হয়েছে স্বাধীনতা–উত্তর ছয়–সাত দশক সময়পর্ব জুড়ে। এঁদের গল্প অনুসরণ করলে আরো একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়, সামাজিক অভিভাবকত্বের নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপ থেকে শিশু–কিশোরদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একলা ঘরে আবদ্ধ হয়ে থেকে জটিল এক সমাজ–মানসিকতার শিকার হয়ে যাওয়ার ধারা। এই ধারাটিকে অনুধাবন করার জন্য এই লেখিকাদের কয়েকটি ছোটগল্পের নির্বাচন প্রয়োজন।

লীলা মজুমদার

'বাইরের এই বিশ্বপ্রকৃতি আর ঘরের নিরাপত্তা, মানুষের ছেলেমেয়ের আর কিছুর দরকার নেই। ইঁকড়ার দেয়াল, টিনের ছাদ, ওখানকার বাড়িগুলো খুব যে নিরাপদ ছিল তা–ও নয়, নিরাপত্তাটি অন্য দিক থেকে আসত। সে মনের জিনিস, তাকে ভাঙা যায়

না, কারণ সে ধরা–ছোয়াঁর বাইরে থাকে''[১২] – আত্মজীবনী 'পাকদন্ডী'তে যে কথা লীলা মজুমদার বলেছেন, তাই তাঁর রচনার মূল সুর। এই যে নিরাপত্তার ওম, এই যে বাতাসে আশ্বাসের সুবাস, এই যে মায়াবী ভালোবাসা – এরই নাম লীলা মজুমদার।

১৯২২ সালে সন্দেশে প্রকাশিত ছোটগল্প দিয়ে যে যাত্রা শুরু, গোটা বিংশ শতক সেই যাত্রাপথের সঙ্গী। বাংলা সাহিত্যই যে তাঁর পথ এবং গন্তব্যও, এও তিনি জানতেন 'বড়োদের জন্য লেখা আমার বিলাস, ছোটোদের জন্য লেখা আমার জীবন''[১৩]। কী লিখবেন তাও বোধহয় তাঁর মনের মধ্যে তৈরি হয়েই ছিল। ডানপিটে, ঘর পালানো ছেলেমেয়েরা তাঁর বড় প্রিয়, ঠিক ততটাই অপ্রিয় মেকিপনা, ভণ্ডামি।

মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে তাঁর কিছু গল্প আলোচনা করা হল –

- 'গণশার চিঠি' গল্পে গণশার নিজের পড়াশোনার জ্ঞানের প্রতি একটুও আস্থা নেই। তেমনই অনাস্থা মাস্টারমশাই–এর প্রতি। নিরাপত্তার চাহিদা গল্পটির ছত্রে ছত্রে, গল্পের শেষ বাক্য দুটি তার প্রমাণ– 'ইস্কুলের কথা এখনও কিছু ঠিক হয়নি। এই ফাঁকে তোমায় লিখছি। এ চিঠির আর উত্তর দিয়ো না। দেখা করতে চাও তো খোঁয়াড়ে খোঁয়াড়ে খোঁজ কোরো। ইতি – তোমার গণশা'।[১৪]
- **'আচার'** গল্পের ভয়াবহ পিসিমা স্নেহহীনতা, অনিরাপত্তার প্রতীক বলেই মনে করত ঘোতন। কিন্তু ঘোতনের ভালোবাসা– নিরাপত্তার চাহিদা তিনি কী অনায়াসে পূরণ করেন–

  'পিসিমা বললেন, ''দরজার কাছে হাওয়া আটকে দাঁড়ালে আচার ভেপসে উঠবে''। ঘোতন ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। পিসিমা আবার ডেকে বললেন ''আচার নিয়ে যাও''। পিসিমা যে কী! বকলেও বিপদে ফেলেন, না বকলেও বিপদে ফেলেন। ঠেঙিয়েও হার মানান, আবার না ঠেঙিয়েও হার মানান। অন্য বুড়োদের মতন একটুও না। ঘোতনের ভারি লজ্জা করল'।[১৫]
- **'ঘোতন কোথায়'** গল্পে নিরুদ্দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ঘোতন – 'কারণ রোজ রোজ ওই ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজা, পড়া তৈরি করা, স্নান করে ভাত খাওয়া, ইস্কুলে যাওয়া, ইস্কুল থেকে সারাটা দিনমান নষ্ট করে বিকেলে আবার বাড়ি ফেরা, সেই খাওয়া, সেই শোয়া – ওইরকম দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যতদিন না অনিশ্চিত ভবিষ্যতে, কবে আমি বড়ো হয়ে ভাল চাকরি করে এইসব জিনিসের ভাল ফল দেখাব – ও আর আমার সহ্য হচ্ছিল না'– পরিবারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির চাহিদা যে কৈশোরের সঙ্গে

জড়িয়ে আছে, এই গল্পই তার প্রমাণ।[১৬]

আশাপূর্ণা দেবী

আশাপূর্ণা দেবীকে নতুন সহস্রাব্দ নতুন নতুন রূপে আবিষ্কার করছে। কোন কোন সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি নারীবাদী লেখিকা হলেও আসলে তিনি সমাজদ্রষ্টা। প্রায় সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে তিনি আলো ফেলেছেন যে কোন পরিবারের সবথেকে অপরিসর, সবথেকে অগম্য কোণেও। তাঁর দ্রষ্টার কলমে শিশু–কিশোর জগৎ ধরা দিয়েছে তাদের সব অসহায়তা – প্রশ্ন – আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে। তাঁর ছোট গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের নীচতা, অক্ষমতা, ভণ্ডামি বারবার বিম্বিত হয়েছে পরিবারের শিশু–কিশোর সদস্যদের দৃষ্টির দর্পণে।

এইরকমই কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় ছোটগল্প আলোচনার দাবি রাখে –

- **'আতঙ্কিত'** গল্পে শিশু টোকন অন্য ছোটদের মতই ভূতের ভয় পায়, কিন্তু তার আধুনিকা মা–র তাতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়, আবার এই মা–ই শ্বশুরবাড়ি থেকে পৃথক হওয়াকে বিলেতফেরত দিদি জামাইবাবুর কাছে সঠিক প্রমাণ করার জন্য টোকনের এই ভূতের ভয়কেই হাতিয়ার করে। টোকন সমাজ–সমর্থন চেয়েও যখন পায় না তখন বাধ্য হয়ে নিজের নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ করার জন্য পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ করে। টোকনের ভয় আসলে তার মা–মাসির মুখোশই খুলে দিতে চায়।

  – 'ভূত প্রেত, দত্যি দানো, দেব, দ্বিজ...শাস্ত্র, সমাজ, নিয়ম নীতি, আইন–কানুন, পাপ–পূণ্য, ধর্ম–অধর্ম, লোক–লজ্জা সর্বধিক ভয় থেকে মুক্ত হলেও আর একটা ভয় কি সর্বদা নাগপাশে বেঁধে রাখে না এদের?

  সে ভয় 'গাঁইয়া' হয়ে থাকার ভয়।

  সে ভয় ভূতের ভয় থেকে কিছু কম নয়'।[১৭]

- গল্পের নাম **'অনায়ত্ত ব্যাধি'** – ছোট্ট মিতিল চায় মামার বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে। কিন্তু মা–র আদেশ তাকে সাঁতার কাটা শিখতে হবে। ফলত – পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ, বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পান তার দাদু।

  'মানবে না তো।

  ডাক্তার রুদ্র গম্ভীর হাস্যে বলেন, শুধু মাকে কেন, জগতের কাউকেই না, ঈশ্বরকে পর্যন্ত না। একটু বড় হলেই স্কুলের চেয়ার টেবিল ভেঙে রাস্তায় বেড়িয়ে

এসে সে স্লোগান দেবে। ''আমাদের দাবি মানতে হবে! চলবে না! চলবে না''।'[১৮]

নবনীতা দেবসেন

মহাকাব্য যাঁর লেখনীতে সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়, রূপকথা হয়ে যায় আধুনিক জীবনের সোনার কাঠি, জীবনের অন্ধকার কোণগুলিও তাঁর সচেতন আলোকিত দৃষ্টিপাত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, প্রাত্যহিক তুচ্ছতা উত্তীর্ণ হয় সরস রম্যে – সেই মানুষটি নবনীতা দেবসেন। কী চায় আজকের শিশু–কিশোররা, কী পায়না তারা, অথচ কী পাওয়া উচিত ছিল –এই সব প্রশ্নের সহজ উত্তরের স্বচ্ছ প্রতিফলন ঘটে তাঁর বহতা লেখনীতে। আজকের পৃথিবী যখন আত্মকেন্দ্রিকতা, ভালোবাসাহীনতা, যান্ত্রিকতা দ্বারা অধিকৃত হয়ে যাচ্ছে, তখন নবনীতা দেবসেন আবিলতাহীন এক প্রায় কল্পজগতের সন্ধান দেন পাঠককে। তাঁর গল্পের বড়রাও ছোটদের মতই মলিনতামুক্ত, ছোটরাও খুব বেশি জটিল মনস্তত্ত্বের শিকার নয়। তাঁর লেখা কয়েকটি ছোটগল্প অনুসরণ করলে আমরা এই সত্যটি বুঝতে পারি অনায়াসেই।

- **'পরীক্ষা'** গল্পটিতে দেখতে পাই মেয়ের পরীক্ষার জন্য বাড়িশুদ্ধু সবাই উদ্বিগ্ন, শুধু মেয়েরই কোন চিন্তা নেই। পারিবারিক বন্ধনে বাঁধা এক পরিবারের ছবি মুগ্ধ করে পাঠককে। পরিবারের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান এই গল্পের মূল সুর।[১৯]
- **'উত্তরকান্ড'** বর্তমানের কলমে রামায়ণের নবীন ভাষ্য। রামের ছেলে লব–কুশ এবংলক্ষ্মণের ছেলে হাসান, হোসেন অপরিচয়ের আড়ালে থাকা আত্মজনকে সহজেই খুঁজে নেয়। নিজেদের সুবিধার জন্য পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ করে সমাজমানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে। তারা বিবেক দ্বারা চালিত হয়ে যুদ্ধবিরোধী বার্তা দিলেও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বড়রা তাতে কর্ণপাত করেন না–
- 'অস্থির হয়ে বালক হাসান–হোসেন তাদের সাদা ঘোড়ায় আর বালক লব–কুশ তাদের লাল ঘোড়ায় চড়ে শূন্যে হাত তুলে ''থামো! থামো!'' বলতে বলতে দু'দিক থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে এলো। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কে শোনে কার কথা? শনশনিয়ে ছুটে এলো লক্ষ লক্ষ তীর, মুহূর্তের মধ্যে চারজন শান্তিপ্রেমী নিরস্ত্র কিশোর মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ...প্রচন্ড যুদ্ধ কিন্তু চলতেই থাকলো, রাগ আর রক্তের ঝাঁঝ লেগে মহারণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ শুকিয়ে পাথর হয়ে গড়িয়ে পড়লো, প্রতিটি তৃণ শুকিয়ে রেণু রেণু বালি হয়ে গেলো, মহারণ্য মহামরুতে পরিণত হলো, রক্তঝরানো যুদ্ধ কিন্তু ফুরালো না।'[২০]

- **'বোন্‌টি'** গল্পের বাবু অপরের সমর্থন খুঁজে পাওয়ার জন্য অনীত বলে এক কল্পসঙ্গীর সাহায্য নেয়। বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে সে পার্থক্য বুঝতে পারে যখন মা তার জন্য একটি বোন নিয়ে আসেন। তখন অনীত নয়, বোনটি তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে। মামাকে 'একগাল লাজুক হেসে বলে ''অনীত? অনীত আর আসে না মামু''। বাবুর ভালোবাসার চাহিদা বোনটিই পূরণ করে দেয়।[২১]
- **'স্বপনের মুক্তিফৌজ আর কালীপদ'** গল্পে স্বপন তার নিজের চারপাশে কল্পনার জগৎ তৈরি করে নিয়ে দিব্বি থাকে। একলা খেলতে খেলতেই তার হাতে ধরা পড়ে যায় তারই সমবয়সী বালক চোর কালীপদ।। কালীপদর অসহায়তা শুধু স্বপন নয়, তার বাড়ির লোকও বুঝতে পারে। স্বপনদের বাড়িতে কালীপদ আশ্রয় পায়, পূরণ হয় তার নিরাপত্তার চাহিদা – 'জীবনদাদা বলে সে স্বপনকে ভীষণ ভক্তিশ্রদ্ধা করে।'[২২]

বাণী বসু

আশির দশক থেকে ছোটগল্প লিখছেন বাণী বসু, এ এমন এক সময় যখন পৃথিবীর বদল ঘটছে দ্রুত, ভেঙে যাচ্ছে যৌথ পরিবার, এমনকি অণু পরিবারও ভেঙে যাচ্ছে। ভোগ্যপণ্যের রঙিন দুনিয়া বদলে দিচ্ছে মূল্যবোধের সংজ্ঞা, বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীটা ছোট হতে হতে ভুবনগ্রামে পরিণত হলেও চেনা দুঃখ সুখগুলো হয়ে যাচ্ছে অচেনা। সহযোগিতা সহমর্মিতার মত শব্দগুলি ঠাঁই পাচ্ছে যাদুঘরে, প্রতিযোগিতা নিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত অস্তিত্বহীনতায়। শৈশব–কৈশোরকেও এই নতুন পৃথিবীর পটভূমিতে দেখেছেন বাণী বসু – তাদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন লেখকের নিরপেক্ষতায়, অভিভাবকের মমত্বে, সমাজমনস্ক মানুষের সচেতনতায়, মানবিক অসহায়তায়।

- **'সুজিত–মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি'** মধ্যবিত্ত বাঙালীর রোজনামচা। স্বামী–স্ত্রী ও কাজের লোকের গল্পে হাসির মোড়কে কোথাও মিশে আছে অসহায়তা। এই দম্পত্তির ছোট–ছেলেটিকে তারা ছোট রাখতেই বদ্ধপরিকর। কিন্তু বাবা–মার চেষ্টা তো আর শেষ কথা বলে না–

  'ছেলেকে তারা হিন্দি ফিলম বা বাজে বাংলা ছবিও দেখতে দেয় না। শিশুকে শিশুই রাখবে এই সুজিতের প্রতিজ্ঞা।'

  অথচ সেই সাড়ে আট বছরের টুবলুই বাবার সঙ্গে পার্কে গিয়ে বলে ''পার্থ বলছিল, আজ একটা খুব মিষ্টি প্রেমের বই আছে বাবা, আজ আমাকে পার্কে নিয়ে এল কেন''?

শিশু টুবলু তার নিজের মত করে পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ করে।[২৩]

- **'শুনঃশেফ'** বয়ঃসন্ধির এক বিভ্রান্ত কিশোরের গল্প, যার নামটাই তার জীবনের প্রথম গ্লানি এনে দিয়েছে। তার নাম 'জ্যোতি নয়, যতি', স্কুলে সে 'যতি দা ডার্ক বা 'ওয়াইতি'। বিকৃত মানসিকতার মাস্টারমশাই অভয়পদবাবু ক্লাসের সব ছেলেদের সামনে বলেন ''এই যতেটা না জন্মালেও কোনও ক্ষেতি ছিল না''। চূড়ান্ত একাকিত্ব এবং অবসাদ গ্রাস করে যতিকে। পরিচিত জগৎ থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নেয়, এক ধরণের 'উইথড্রয়াল সিন্ড্রোম' দেখা দেয় তার মধ্যে। নিজের চেহারা নিয়ে শুধু নয়, নিজের অস্তিত্ব নিয়েই সে লজ্জিত। চরম বিপন্নতায় পালাতে পালাতে সে যখন হাঁপিয়ে যায়, তখনই বুঝতে পারে তার পুরো পরিবার অসীম ভালোবাসায় মমতায় তাকে ঘিরে আছে। বাবার কাছ থেকে সে পায় ঘরে ফেরার মন্ত্র, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মন্ত্র – ''আর মনটা যতি, মনটাকেও ঠিক করো, শক্তসমর্থ''।[২৪] আত্মবিশ্লেষণ, ভালোবাসার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, সামাজিক স্বীকৃতির চাহিদা গল্পে পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছে।
- একটা ছোট্ট ফুরফুরে মেয়ের গল্প **'সমুদ্র'**। বছরে দু'বার টুনি নামের মেয়েটা টের পায় তারা গরিব, যখন, দুর্গাপুজোর সময় বন্ধুদের থেকে কম জামা পায় আর যখন বড়দিনের ছুটিতে বন্ধুরা বেড়াতে যায়। বিদেশবাসী কাকার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে টুনি সমুদ্র দেখতে পেল, আর সেই সমুদ্রের গুনগুন শব্দ শুনতে পেল টুনির ঘরে থেকে যাওয়া বাবার বুকে।[২৫]

  নিরাপত্তা, ভালো, স্বস্তির সমুদ্র টুনিকে ঠিক পথ চিনিয়ে দিল।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

ছোট পরিবার মানেই যে সুখী পরিবার নয়, বারবার নিজের ক্ষুরধার লেখনীতে একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। যৌথ পরিবারে যে সম্পর্কগুলো সামাজিকতার ঘেরাটোপের আড়ালে পযত্নে নিজেদের লালন করতে শিখত, সেই সম্পর্কগুলোই যখন ছোট্ট পরিবারে আবরণহীন হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল, ঘুচে গেল সব লাজলজ্জার আড়াল। গোপনীয়তা–লোভ–সন্দেহ–সম্পর্কহীনতার মধ্যে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েগুলো তাই শুরুতেই হয়ে গেল মূল্যবোধের শিকড়হীন।

- **'বিকেল ফুরিয়ে যায়'** মেয়েবেলার গল্প, কিশোরীবেলার গল্প। চারবন্ধু কাটাচ্ছিল নির্ভার সময়। দীপিকার পারিবারিক সমস্যা এবংঅর্চনার পড়াশোনার

প্রতি মনোযোগ চারবন্ধুর সংখ্যা কমিয়ে দুই–এ দাঁড় করায়। মানসীর কিশোরীবেলার প্রেম হারিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাসভঙ্গ শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ওদের। এইভাবে জটিল পৃথিবীর আবর্তে আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায় তারা। শ্রদ্ধা–প্রেম–সমর্থন–ভক্তি–বিশ্বাস সব চলে গিয়ে শুরু হয় যুদ্ধের প্রস্তুতি।[২৬]

আত্মপ্রতিষ্ঠা এবংস্বীকৃতির চাহিদা পায়ের তলায় মাটি শক্ত করে দেয় ওদের।

- বর্তমান সময়ের সার্বিক অবক্ষয়ের নিষ্ঠুর বাস্তবকে উপস্থিত করে **'সাদা গুঁড়ো লাল রং'**। শুভময় আর নীলার জীবন অর্থকেন্দ্রিক। সেই অর্থ ''জোগাড়'' করার ক্ষেত্রে (হ্যাঁ, রোজগার নয়, জোগাড় করার ক্ষেত্রে) কোন নীতিবোধ তাদের রাস্তা জুড়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু যখন তাদের আত্মজবাবার ঘুষের টাকায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেনে সেই রূঢ় বাস্তব সহ্য করতে পারে না তারা।[২৭]

  মূল্যবোধের অবক্ষয় এবংনীতিহীনতা তিনটি চরিত্রকেই গ্রাস করে নিয়েছে।

- **'রামধনু রঙ'** শৈশরের রূপকথা, আসলে যে শৈশব থেকে রূপকথাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে প্রতিনিয়ত, সেই শৈশবের রূপহীনতার কথা। নামী ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ভর্তি হওয়ার ইঁদুরদৌড়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েচে যে শিশুকে, যে শিশুর জীবন থেকে আনন্দ, আত্মবিশ্বাস, নির্ভরতা নামক শব্দগুলি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে রোজ, সেই শিশু কিন্তু চোখ মেলে দেখতে চায় অবারিত আকাশে রামধনু রঙ।[২৮]

  নিরাপত্তা, ভালোবাসার চাহিদা মিশে যায় শৈশবের গল্পে।

- **'ইচ্ছের গাছ'** একটি ছোট্ট ছেলে আর তার মা–র গল্প, তাদের ইচ্ছের দ্বৈরথের গল্প। ছোটবেলা থেকে মা নিজের ইচ্ছে ছেলের ওপর চাপিয়ে দিতে দিতে কখন তার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন নিজেও বুঝতে পারেননি। স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা মা–র কাছ থেকে ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে যায় যোজন দূরে।[২৯]

লীলা মজুমদারের জন্ম ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, আশাপূর্ণা দেবীর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ দু'জনে একেবারেই সমসাময়িক। নবনীতা দেবসেন জন্মেছেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, বাণী বসু ১৯৩৯–এ, সমসাময়িক এঁরাও। লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে এঁদের বয়সের তফাৎ ৩০ বছর। সুচিত্রা ভট্টাচার্যর জন্ম ১৯৫০–এ। অর্থাৎ একমাত্র তিনিই জন্মেছেন স্বাধীন ভারতে। লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দাঙ্গা, মন্বন্তর সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। সমস্ত পৃথিবীতে তখন

ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল রাজনীতির অঙ্ক, রাষ্ট্রের ভূমিকা আর সেইসঙ্গে সমাজের গঠন। লীলা মজুমদারের আলোকিত শৈশব তাঁর কলমে এনেছে অস্তি, তাঁর সৃষ্ট শৈশব–কৈশোরের নানা চরিত্র শেষপর্যন্ত সেই অস্তিতে বিশ্বাসী। আশাপূর্ণা দেবী সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে বাণীর সাধনা করেছেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এবং মন ছিল তীক্ষ্ণ। তাই ইতি আর নেতি দুই–এ মিলেই তৈরি হয়েছে তাঁর শিশু–কিশোর চরিত্রগুলি। নবনীতা দেবসেন, বাণী বসুর শৈশবেও এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, দাঙ্গা, মন্বন্তর। নবনীতা দেবসেনের শৈশবে তাই নোয়াখালি আর নাগাসাকি একই সর্বনাশের অনুষঙ্গ নিয়ে আসত। সর্বনাশ থেকে মুক্তির পথে নবনীতা দেবসেনের লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় লীলা মজুমদারের লেখার মতোই মায়াবী ভালোবাসার ছোঁয়া। বাণী বসু, আশাপূর্ণা দেবীর মত বাস্তবের সড়ক এবং গলিপথ উভয়ের ছবি এঁকেছেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প লেখার সময়কালে বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে স্থানীয় জীবনে ঘটে যাচ্ছে উথালপাথাল পরিবর্তন। এই বদলে যাওয়া জীবনের গল্প সুচিত্রা লিখেছেন বাস্তবের কালিতে।

যে দুটি চাহিদা পাঁচজন লেখিকার লেখাতেই বর্তমান, সে দুটি হল ভালোবাসার চাহিদা এবং নিরাপত্তার চাহিদা। একটি শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে তখন আশ্বাসভরা চোখ, সাহায্যের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হাত, মমত্বভরা মন তাদের জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই লেখিকারা তা অনুভব করেছেন বলে বারবার তাঁদের গল্পে এই চাহিদাগুলি ঘুরেফিরে এসেছে। শিশু–কিশোরদের মানসিক চাহিদার প্রকৃত রূপ তাঁদের ছোটগল্পের পরিসরে অঙ্কিত হয়েছে। সাহিত্যপাঠ এইভাবেই হয়ে উঠতে পারে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, যা মেধার সঙ্গে মননকে যুক্ত করতে পারে অনায়াসেই।

তথ্যসূত্র :

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও রূপ, সাহিত্যে ছোটগল্প (কলকাতা : ডি এম লাইব্রেরি, ১৩৬৫), পৃ. ২১৯

২। গঙ্গোপাধ্যায়, ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও রূপ, সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃ. ২৫৩–২৫৪

৩। প্রণব কুমার চক্রবর্তী, নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য, শিখনের মনস্তত্ত্ব (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫), পৃ. ২৬

৪। চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, শিখনের মনস্তত্ত্ব, পৃ. ৩২

৫। চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, শিখনের মনস্তত্ত্ব, পৃ. ১০১

৬। Dr. Sujit Pal, Rakheebrita Biswas, Dr. Pranabkrishna Chanda, *Childhood and Growing up* (Kolkata : Aheli Publishers, 2015), p. 121

৭। Pal, Biswas and Chanda, *Childhood and Growing up* (Kolkata : Aheli Publishers, 2015), p. 121

৮। রাধারাণী দেবী, নারী তুমি অর্ধেক আকাশ, সঃ নবনীতা দেবসেন, সমীর রক্ষিত ও শ্যামলী গুপ্ত (কলকাতা : সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ১৮০
৯। রাধারাণী দেবী, নারী তুমি অর্ধেক আকাশ, পৃ. ২১৯
১০। অঞ্জলি দাশ, সই, সঃ নবনীতা দেবসেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য পুষ্প, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর, ২০০৪, পৃ. ৪০১
১১। মহাশ্বেতা দেবী, সই, সঃ নবনীতা দেবসেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য পুষ্প, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর, ২০০৪, পৃ. ১৩৭
১২। লীলা মজুমদার, পাকদণ্ডী, লীলা মজুমদার রচনাবলী, ৬ষষ্ঠ খণ্ড (কলকাতা : লালমাটি প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ২২১
১৩। মজুমদার, পাকদণ্ডী, পৃ. ৪২১
১৪। মজুমদার, পাকদণ্ডী, লীলা মজুমদার রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫
১৫। মজুমদার, পাকদণ্ডী, লীলা মজুমদার রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭
১৬। মজুমদার, পাকদণ্ডী, লীলা মজুমদার রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১
১৭। আশাপূর্ণা দেবী, গল্পসংগ্রহ ১ম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯), পৃ. ২৫৮
১৮। আশাপূর্ণা দেবী, গল্পসংগ্রহ ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯
১৯। নবনীতা দেবসেন, গল্পসংগ্রহ ১ম খণ্ড (কলকাতা : দে'জপাবলিশিং, ১৪২০), পৃ. ১৫৭
২০। দেবসেন, গল্পসংগ্রহ ৪র্থ খণ্ড(কলকাতা : দে'জপাবলিশিং, ১৪১২), পৃ. ১২০
২১। দেবসেন, গল্পসংগ্রহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১
২২। দেবসেন, গল্পসংগ্রহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭
২৩। বাণী বসু, গল্পসংগ্রহ ১ম খণ্ড (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫), পৃ. ১
২৪। বসু, গল্পসংগ্রহ ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪
২৫। বসু, গল্পসংগ্রহ ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪
২৬। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ গল্প, ১ম খণ্ড, পুষ্প (কলকাতা : ২০০৩), পৃ. ৯৯
২৭। ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ গল্প, ১ম খণ্ড, পুষ্প, পৃ. ১৩৬
২৮। ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ গল্প, ১ম খণ্ড, পুষ্প, পৃ. ২৪৬
২৯। ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় খণ্ড, পুষ্প, পৃ. ২৪৬